কাশি ও কাশীবাসিনী

চিত্রা দেব

'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী অন্নপূর্ণাকে বলেছিল, 'মা আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিও না।'

সংলারে বিনোদিনীর জন্যে সত্যিকারের কোন জায়গা সেদিন ছিল না, তাকে কাশী যেতে হয়েছিল। কতকটা এইভাবে পল্লীসমাজের রমাকেও নির্বাসনে যেতে হয়েছিল বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে, কোন তীর্থস্থানে 'যেখানে চোখ তুললেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে', যা স্বাভাবিকভাবেই কাশীকে মনে পড়িয়ে দেয়।

একসময় বাঙালী মেয়েদের আশ্রয় নেবার জায়গা হিসেবে কাশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার উদাহরণরূপেই রবীন্দ্র ও শরৎ - উপন্যাসের দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। আরো আছে। অজস্র। 'নৌকাডুবি', 'পথনির্দেশ', 'বামুনের মেয়ে', 'চন্দ্রনাথ', 'শুভদা', 'শ্রীকান্ত' সর্বত্র, দেখা যাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাঙালী মেয়েরা কাশী যাচ্ছেন, যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ছাড়াও আছে অভিমানিনী বিধবা জননীর একমাত্র অস্ত্র, বহু ব্যবহৃত পুরনো সংলাপ, 'আমাকে তোরা কাশী রেখে আয়'

কেন এমন হত? বাংলা গল্প - উপন্যাসে কেন বার বার ঘুরে ফিরে আসত কাশীযাত্রা কিংবা কাশীবাসের প্রসঙ্গ, এর কি সত্যিই কোন কারণ ছিল? কাশীতে কিভাবেই বা দিন কাটত এই কাশীবাসিনীদের? প্রশ্ন জাগে? উত্তর মেলে না সহজে। সর্বহারা নিঃসহায় নারীদের একটানা দুঃখের নিঃশ্বাসে কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির দশাশ্বমেধ ঘটে, বেণীমাধবের ধ্বজা বাষ্পাচ্ছন্ন ও ম্লান হয়ে ওঠে এক একসময়। যাঁরা কাশীবাসীনীদের নিয়ে কিছু অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন, তাঁরা দেখেছেন বঙ্গ-নারীদের তীর্থবাসের আগ্রহও জীবন ধারণের সহজ উপায় তুলনামূলকভাবে কাশীতেই ছিল। এখানে জিনিসপত্রের দাম ছিল সস্তা কাছেই ছিল পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গা আর বাবা বিশ্বনাথের মন্দির। মৃত্যুর পরেও চিন্তা নেই, কাশীতে মৃত্যু হলে, হিন্দুদের বিশ্বাস, শিবলোকপ্রাপ্তি হবেন; সুতরাং মোক্ষ বিলাসিনীরা, যাঁদের জীবনে বিলাসিতা বলে কিছুই ছিল না, তাঁরা ভিড় করতেন কাশীতে। যদিও কাশীর সঙ্গে আরও দুটি তীর্থের নাম ভিড় করে আসে বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে, সে দু'টি হল বৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্রপুরী। পূর্বাঞ্চলের অসহায় নারীদের শেষ আশ্রয় ছিল এই তীর্থগুলি। এদের চেয়ে কাশীর মাহাত্ম্য পুণ্যের দিক দিয়ে বেশি কিনা, জানা নেই তবে আকর্ষণ একটু বেশি ছিল নিঃসন্দেহে এবং বাড়তি আকর্ষণটুকু সম্ভবত পতিত পাবনী গঙ্গার এবং যতদূর মনে হয়, উপার্জনের ক্ষেত্র হিসেবেও কাশী নগণ্য ছিল না বলে। বৃন্দাবন কিংবা পুরীর তুলনায় জনবহুল বাণিজ্যকেন্দ্র কাশীতে জীবিকার্জনের জন্যে কাজ, বিশেষত সম্পন্ন লোকের বাড়িতে এবং কোন চতুষ্পাঠী বা আশ্রমে রান্না করার কাজ পাওয়া যেত। সাম্প্রতিক কালে এক কাশীবাসিনীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে জানা গেছে, জনৈকা নীলিমা ভট্টাচার্য দেশ বিভাগের পরে কাশীতে এসে রয়েছেন একটানা তিরিশ বছর, তিনি যেদিন প্রথম কাশীতে এলেন সে সময়কার কথা। '...ওই বাড়িরই আর একজন তার ঘরের দাওয়ায় থাকার ব্যবস্থা করে দিল, ভাড়া মাসে আট আনা, পরদিন পাশের ঘরের একজন কয়েকটা বাড়ি পরে এক বাড়িতে নিয়ে গেল রান্নার কাজের জন্য। মাইনে দশ টাকা। তখন দশ টাকায় মাস চলে যেত। পরে মাইনে বেড়ে বারো টাকা হল। তখন আলাদা ঘর নিলাম, ভাড়া দু'টাকা। ভাই -ও টাকা পাঠাত মাঝে মধ্যে। লোকের বাড়ি ছাড়া গোপালবাড়ির চত্বরেও রান্না করেছি। কত বিদ্যার্থীদের খাইয়েছি।'

কাশীতে বাঙালী মেয়েরা, বিশেষ করে বিধবা, কবে থেকে যাচ্ছেন, তার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও তৈরি হয়নি। ১৯শ শতকের গোড়াতেও যে বাঙালী বিধবারা কাশীবাস করবার জন্যে স্বদেশের আশ্রয় ত্যাগ করে যেতেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বৈষ্ণবীরা সম্ভবত বেশি যেতেন বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে। তারকেশ্বরেও বিধবাদের অনেকে যেতেন দেবস্থান হিসেবে। সন্ন্যাসিনীরাও কাশীতেই বেশি থাকতেন। বাঙালী সন্ন্যাসিনী যোগিনী - মা শিষ্য শিষ্যাদের নিয়ে থাকতেন কাশীতে। তবে সন্ন্যাসিনীদের কথা স্বতন্ত্র। ধরে নেওয়া যেতে পারে, ১৮শ শতক থেকেই বিধবাদের তীর্থবাসের প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন বাল্যবিবাহ, গৌরীদান ও কিশোরী ভজনার সঙ্গে সঙ্গে কুলীন পাত্রে কন্যা দিয়ে কুলগৌরব বৃদ্ধির প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, তখন বিভিন্ন বয়সের বিধবা প্রায় প্রতিটি বাঙালী পরিবারে অনাথা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। এ সময় থেকেই বিধবাদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে কাশী যাবার আগ্রহ দেখা দেয়। অনেক সময় মেয়েরা যেতেন স্বেচ্ছায়, আবার অনেক সময় বাধ্য হয়ে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে; আগে স্বেচ্ছাবাসিনীদের কথাই বলি।

আগেই বলেছি, কাশীতে স্বাধীনতা ছিল, জীবিকা অর্জনের সুযোগ ছিল। বাংলাদেশের গ্রামে, কলকাতা শহরে পরের বাড়িতে রান্না করার কাজ নিতে গেলে চক্ষু লজ্জায় বাধত, কারণ শ্রমিক নারীরা ছাড়া কেউ কায়িক পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করলে ভারি নিন্দে হত। ফলে আত্মীয়তার সূত্র ধরে পরের বাড়িতে বিনা মাইনের দাসীবৃত্তি করতে হত বহু বিধবাকে। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু উপায় ছিল কাশীতে। গুণবতীরা কেউ কেউ পেয়েছিলেন ভিন্নতর জীবিকার সন্ধান। ১৯ শতকের প্রথম দিকে কাশীবাসিনী হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম অনেকেই জানত। তিনি ছিলেন রাঢ়বঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণ বিধবা। অধিকাংশ কুলীন বধূর মতোই তাঁকেও জীবন কাটাত হয়েছিল পিতৃগৃহে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর বাবা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তিনি মেয়েকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে নিতান্ত দূরবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে না পেরে হটী আরো পাঁচজন নিরাশ্রয় বিধবার মতোই কাশীবাসের সংকল্প নিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেন। তংার পরবর্তী জীবন সম্মানের। শোনা গেছে, হটী কাশীতে এসে স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং শেষ নিজেই একটি ততুষ্পাঠী খুলে বসেন। কেউ কেউ মনে করেন, নারীর শাস্ত্র পাঠ ও শিক্ষাদানের অধিকার আছে কিনা তা নিয়ে কাশীর পণ্ডিতদের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন যে বঙ্গললনা, তিনি আর কেউ নন। বিদ্যালঙ্কার উপাধি থেকেই বোঝা যায়, হটী পরাজিত হননি।

হটীর মতো কেউ কি ছিলেন না, কাশীতে না হোক, হটীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বর্ধমানের চিরকুমারী রূপমঞ্জরী ও হরিপুরের বালবিধবা কাশীশ্বরী। কাশীতে গিয়েই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন জীবনে তাঁদেরও কিছু করার আছে। রূপমঞ্জরী কাশী থেকে দেশে ফিরে হয়েছিলেন হটু বিদ্যালঙ্কার। আর কাশীশ্বরী? তাঁর ভাইঝি প্রসন্নময়ী দেবীর ভাষায়, 'কাশীশ্বরী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হটী তর্কালঙ্কার সাজিয়া মুন্ডিত মস্তকে সগৌরবে গ্রামে ফিরিয়ে আসিয়া এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন।' এঁদের নাম দুটি থেকে ই বোঝা যাচ্ছে কাশীতে তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে কার আদর্শে এঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে যখন নারী স্বাধীনতার দাবি, স্ত্রী - শিক্ষার জন্য আন্দোলনের উন্মেষ হয়নি, সে - সময় হটী চতুষ্পাঠী খোলার মতো সাহস ও শক্তি অর্জন করেছিলেন কাশীতে গিয়েই। তাই, কাশীতে নারীরা যে একটু মুক্তির স্বাদ পেতেন সে কথা অনুমান করা খুব অনুচিত বলে মনে হয় না। এর প্রায় একুশ বছর পরে, ১৯০১ সালে সরলাবালা সরকার কাশীতে গিয়ে অনুভব করেছিলেন, 'স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকারও শহরবাসিনীর পক্ষে

কম আনন্দের নয়।' কলকাতা শহরে তিনি এই স্বাধীনতা, এই মুক্তির স্বাদ কখনো পাননি। তাই কাশীর দৃশ্যগুলি তাঁর কাছে 'একখানি বায়স্কোপের ছবি'র মতোই মনে পড়ত।

হটীর মতো বিদুষী না হলেও বহু বিধবা প্রতি বছর আসত কাশীতে। বালবিধবা নিস্তারিণী দেবী এসেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে। খন্যান গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল; নিজের বাড়ি নয়, ভাইদের সংসারেই তিনি কাটিয়ে ছিলেন সারা জীবন। তারপর ভাইপো - ভাইঝিরাও সকলে যখন বড় হয়ে গেল তখন সংসারে ঠাঁই হল না নিস্তারিণীর। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমি তখন খুব বুড়ো হয়ে গেছি। এক চোখে মোটে দেখতে পাইনি। প্রাণধন এলে নবীঝি বল্লে, পিসিমাকে কেন কাশী নিয়ে রেখে এসো না। প্রাণধন বল্লে, 'পিসীমা কাশী যাবে। আমি বল্লুম, 'কার ভরসায় যাই, একটি চোখ গেছে।'

পরে অবশ্য ভেবেচিন্তে নিস্তারিণী স্থির করলেন, কাশী যাওয়াই ভাল, না গিয়ে করবেনই বা কী, 'সকলে যে যার আপনা আপনা থাকে, কেউ আর আমার খোঁজ নেয় না।' সত্যি কথা বলতে কি নিস্তারিণীর 'সেকালের কথা'য় তৎকালীন হিন্দু সমাজের অনেকগুলো ছবি নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে আছে। আমরা অতীতের অনেক সুখ - স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে যখন নিজেদের হৃদয়হীন দিকগুলোকে একেবারে ভুলে যাই, 'সেকেলে কথা' তখন সব মনে পড়িয়ে দেয়। বঙ্গনারীদের কাশীযাত্রা যে নিছক গল্প নয়, গল্পের মতো করে বলা জীবন নয়, সে কথা জানা যায় এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাশীবাসিনীর স্মৃতিকথা পড়ে। বঙ্গনারীর মনে কাশীর স্মৃতি দাগ কাটত বেশি, তাঁরা তীর্থ হিসেবে কাশীকে গুরুত্ব দিতেন, ফিরে এসে লিখতেন কাশীর স্মৃতি।

আবার নিস্তারিণীকে অনুসরণ করা যাক। তিনি বেশ খ্যাত নামা পরিবারের কন্যা। তাঁর বাবা হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঠগী দমনকারী শ্লীম্যান সাহেবের ডান হাত, মেজো ভাই রেভারেন্ড কালীচরণ, বড় দাদা ভবানীচরণের পুত্র ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। যাক সে কথা, নিস্তারিণী বলেছেন, 'আমি সাত পাঁচ ভাবলুম। এতদিন পরের ভূতের ব্যাগার খেটে মল্লুম; এখন এক চোখ গেছে। পঞ্চাশোর্ধে বনে যাওয়ার মতো আমার কাশী যাওয়া। কালীর মত পেলুম না; তাঁর ইচ্ছে আমি নিকটেই থাকি। সে বল্লে যে, কে দেখবে। যাকে দেখবার কেউ নেই তাকে বিশ্বনাথ দেখবে; এ কথায় তার রাগ হল। আমিও রেগে বল্লুম, দাদা, তুমি দেবে না, তাই বল। আমি কাশী যাবোই যাবো। এত বিধবা - আশ্রম আছে তুমি আমায় কেন লিখে দাও না।'

নিস্তারিণী কাশী গিয়েছিলেন গত শতকের একেবারে শেষ দিকে। তখন সেখানে বহু বিধবা - আশ্রম গড়ে উঠেছে। সম্পন্ন মহিলারাও দান করতেন। রানী ভবানীকে বলা হত সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তাঁর দূর্গাবাড়িতে অনেকেই আশ্রয় পেতেন। নিস্তারিণী কোন আশ্রমে স্থান পাননি, 'কাশীতে গিয়ে দূর সম্পর্কের খুড়োর বাড়ি ভাড়া করলুম। রাঁধি বাড়ি খাই। প্রাণধন চার টাকা দেয়।' প্রাণধন ছিলেন নিস্তারিণীর ছোট ভাইয়ের ছেলে। মেজো ভাইপোও কিছুদিন দিলেন তিনটি করে টাকা। এভাবেই দিন চলে যেত। কিছুদিন পরে নিস্তারিণী আবার বলেছেন, 'কাশীতে দিনকতক থাকতেই আর একটা চোখও গেল। আমি অন্ধ হলুম। আটকালে রাঁধি বাড়ি। এখনও কারো হাতে খাবো না— পণ বজায় রেখেছি। আমার নব্বই বছর বয়স হয়েছে। প্রাণধন মাসে দশ টাকা পাঠায়; তা শুনে অনেকের চোখ টাটায়।'

নিস্তারিণীর এই সামান্য ক'টি কথায় তাঁর সমসাময়িক অন্য কাশীবাসিনীদের অবস্থাও অনুমান করা চলে। সবারই অবস্থা একরকম, আবার ধনীদের দানেও অনেকের দিন কাটত। মৈমনসিংয়ের এক তালুকদার বিমলা দেবী কাশীতে প্রচুর দান করেছিলেন। শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক হাজার ব্রাহ্মণ বিধবাকে ভোজন করিয়ে তিনি তাঁদের নগর চার টাকাও একটি করে লুই বা শীতবস্ত্র দান করেন। সেকালের সংবাদপত্রের পাতা খুঁজলে এরকম আরো দানের খবর পাওয়া যাবে। দরিদ্র বিধবাদের সাময়িক অভাবও এতে কিছুটা কমত বৈকি।

কাশীতে মেয়েদের জন্য কিছু করার কথাও ভাবছিলেন প্রবাসী বাঙালীরা। সেখানে বহু বাঙালী বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথের দিদি সৌদামিনী দেবীর কন্যা ইরাবতীর বিবাহ হয়েছিল কাশীতে। বিয়ের আঠেরো বছর পরে তিনি জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলেন। কিন্তু ইরাবতীর কোন স্মৃতিকথা নেই, থাকলে হয়ত আমরা কাশীর আর একটি রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে পাততুম। গগনেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রমোদকুমারী দেবীর পিতাও শেষ জীবনে কাশীতেই বাস করতেন এবং দেখা গেছে বহু প্রবাসী বাঙালীই শেষ জীবন কাশীতে কাটাবেন মনস্থ করে একটি বাড়ি করে রেখেছেন। এভাবেই কাশীর বাঙালী-সমাজ বড় হয়ে উঠেছিল। ১৯২৫ সালে কাশীতে বাঙালী মহিলারা স্থাপন করেন 'কাশী বরপণ নিবারণী সভা'—উদ্যোক্তা ছিলেন মনোরমা দেবী ও 'মনোজবা' রচয়িত্রী নিস্তারিণী দেবী। কাশিবাসিনী মেয়েদের জন্যে আরো নানারকম চিন্তা - ভাবনা এঁদের ছিল।

মনোরমা দেবীর 'নারী কল্যান বা আমার জীবন' -এ তাঁর মনে প্রবল ধর্মভাব জাগ্রত হবার প্রসঙ্গে তাঁর কাশী আগমনের কথাটি আছে, '...তখন আমি স্বামীর নিকট ছিলাম, দাদা বলিলেন যে কাশী চল, তোমাকে চন্দ্রগ্রহণে কাশীস্নান করাইব, স্বামীর যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও আমার হাতে কখনও টাকা থাকিত না, কারণ আমি কখনও জমা করিতে শিখি নাই, চিরদিন শূন্য হস্ত, দশ টাকা হাতে লইয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলাম।' এরপরে মনোরমা কাশীতে দীর্ঘদিন ছিলেন, তাঁর স্বামী ভেলপুরায় সিভিল সার্জেনরূপে কাজে যোগ দেওয়ায় মনোরমা পক্ষে কাশীতে নারী কল্যাণ সমিতির কাজ করাও সহজ হয়।

প্রবাসী লেখিকা পূর্ণশশী দেবী কাশীতে এসেছিলেন অত্যন্ত দূরবস্থার মধ্যে। ঠিক কাশীবাস করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কোথাও কোন আশ্রয় না পেয়েই তিনি কাশীতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট ছেলে সত্যেন্দ্র। আত্মকথা 'মনে পড়ে' লেখবার সময় বিদুষী পূর্ণশশী শুধু নিজের কথা নয়, অন্য কাশীবাসিনীদের কথাও লিখেছেন এবং লিখেছেন সেই দুর্ভাগিনীদের কথা, যারা কাশীতে এসেছিল বাধ্য হয়ে, সমাজে থাকার উপায় যাদের ছিল না।

পূর্ণশশী কাশীতে এসে আশ্রয় পেলেন বাঙ্গালীটোলায়। 'শ্বশুর শাশুড়ির আমলে বাঙ্গালীটোলার ভিতর প্রবেশ করি নাই কখনো—মাঝে মাঝে বাহির হইতেই দেখিয়াছি, মনে হইত ইহার মধ্যে মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করে কেমন করিয়া? আজ বিপাকে পড়িয়া সেইখানেই আশ্রয় লইতে হইল এবং মনে হইল বাঁচিলাম।' এবার তিনি প্রকৃত কাশীর রূপ দেখতে পেলেন। সে কী রূপ?

ইতিপূর্বে সরলাবালা দেখেছিলেন 'বায়স্কোপের ছবি'র মতো কাশীর বাইরের রূপ, 'গলির পর গলি, সারি সারি রকমারি দোকান। ধীরে সুস্থে ষাঁড়গুলি ফুল বেলপাতা চিবাইতে চিবাইতে পথচারীর গায়ে পাশ দিয়া চলিতেছে। পিতলের বাসনের দোকানগুলি সোনার বাসনের মত ঝকঝক করিতেছে। বেনারসী কাপড়ের দোকানে দোকানী স্তূপাকার কাপড় খুলিয়া খুলিয়া খরিদকারীকে কাপড়ে কারুকার্য দেখাইয়া প্রলোভিত করিতেছে। শ্বেত পাথরের দোকানে দোকানী 'আইয়ে আইয়ে' আহ্বান, আর গলিতে গলিতে খাবারের ও চুড়ির ও কাঠের খেলনার দোকান। গঙ্গার ধারে ঘাটে ঘাটে প্রকাণ্ড ছাতার নিচে পাণ্ডার দল, দলে দলে স্নানার্থী, কীর্তন ও গ্রন্থপাঠে মুখরিত গঙ্গাতীর। বেণীমাধবের ধ্বজায় উঠিলে তাসের ঘরের মতো বাড়ির পর বাড়ির সারি দেখিতে পাওয়া যায়। কতই না বিচিত্র জীব।'

অন্তঃপুরিকা হিসেবে বধূজীবনে পূর্ণশশী ও সরলাবালার মতোই কাশীর এ-রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু এবার কাশীবাস করতে এসে দেখলেন, 'সোনার কাশীতেও কলঙ্ক কালিকা আছে বিলক্ষণ। বিশ্বনাথের পুণ্য রাজ্য... ভণ্ডামি, প্রতারণা ও পাপে

কণ্ঠকিত দেখিলে অবাক হইতে হয়। বিশেষ করিয়া নারীর লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন, এখানে যেমনটি দেখিয়াছি অমন আর কোনোখানে দেখিনাই। ...বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয়ে থাকিয়া কেহ পাপ ক্ষয় করিতেছে আবার কেহ বা পাপের ঘরা ভারি করিতেছে আরো'।

বিপথগামিনী নারীর সংখ্যা কাশীতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার একটা প্রধান কারণ কলঙ্ক এড়াবার জন্যে অনেকেই মেয়েকে নিয়ে কাশীতে চলে আসতেন নিরুপায় হয়ে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রলোভনের পিচ্ছিল পথে একবার যে হতভাগিনী পা বাড়াত সহজভাবে বাস করবার অধিকার তার থাকত না। কেউ এরপরে সংসারে ফিরে যেত আবার কেউ থেকে যেত কাশীতেই। 'পল্লী সমাজে' সুকুমারীকে অপমান করায় তার মা ক্ষান্ত বলেছিল, 'বলি হ্যাঁ, গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথা কও না, তোমার ছোট ভাজ যে ঐ ভাঁড়ার ঘরে পান সাজচে, সে আর বছর মাস দেড়েক ধরে কোন্ কাশীবাস করে অমন হলদে রোগা সলতেটি হয়ে ফিরে এসেছিল শুনি, সে বড়লোকের বড় কথা বুঝি? তবু এভাবেই জোড়াতলি দিয়ে অনেকে আত্মসম্মান বাঁচাতেন।

এতদিন এদের দিয়ে ভাবনা করার কেউ ছিল না। ক্রমে অল্পবয়স্কা বিধবাদের জন্যে নানারকম আশ্রম খোলার কাজ শুরু হল। কাশীতে সরোজিনী দেবী অন্নপূর্ণা স্ত্রী শিক্ষালয়ে দুঃস্থ বিধবাদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা শুরু করেন সুতো কাটা, তাঁত বোনা, খেস বোনা, কাঁথা সেলাই করা প্রভৃতি শিখিয়ে। সেই সঙ্গে চেষ্টা করতেন সামান্য লেখাপড়া শেখাতে। একই চেষ্টা শুরু করেন পূর্ণশশী নিজেও, 'মাতৃমঠ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের ভার নিয়ে। সেখানেও মেয়েদের লেখাপড়া ও হাতে - কলমে কাজ শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। 'শুধু কুমারীই নয়, বিবাহিত এবং জনকয়েক বালবিধবাও স্কুলে ভর্তি করিয়াছিলাম বুঝাইয়া সুঝাইয়া। কেবল গঙ্গাস্নান আর ভিজা কাপড়ে গলি গলি ঘুরিযা ঠাকুর দর্শন করিলেই ধর্মসাধন হয় না তো— ধর্মের সঙ্গে কর্ম চাই—'

বালবিধবা কাশীবাসিনীদের স্কুলে পড়ানো খুব সহজ ছিল না। কাশীতে মেয়েরা অল্পবিস্তর মুক্তির স্বাদ পেত ঠিকই কিন্তু অনেকেই বল, 'এ কাশী শহরে আমাদের দেশের কত লোক যাওয়া - আসা করছে, কেউ যদি দেখে ফেলে— সোমও বিধবা মেয়ে বই বগলে স্কুলে যাচ্ছে— তবেই তো একটা কেলেঙ্কারি। পূর্ণশশী একজনের মুখে কথাটা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন কেন না তাঁর সেদিন মনে হয়েছিল 'সোমত্ত মেয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে গলি গলি ঘুরিযা ঠাকুর দর্শন করিয়া বেড়ায়, তাহাতে বংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, আর বই বগলে স্কুলে গেলেই কেলেঙ্কারি। অদ্ভুত বিধান কিন্তু!' আসলে পূর্ণশশীও ছিলেন প্রবাসী মেয়ে, বাংলাদেশে জীবন দু-একবারের বেশি আসেনি, তাই এখানকার সামাজিক বিধিনিষেধগুলো তাঁর চোখে অস্বাভাবিক বলেই মনে হত।

নিজের জীবনকথার ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণশশী শুনিয়েছেন একাধিক দুর্ভাগা নারীর গল্প। মালতী ও তার পিসী এল তাঁর প্রতিবেশিনী হয়ে। বালবিধবা মালতী কোন এক বিখ্যাত বংশের মেয়ে। একই বাড়িতে দেখা গেল শৈলী ও তার মায়ের সঙ্গে মালতীর পরিচয় বেশ গাঢ় হয়ে উঠছে। পূর্ণশশী জানতেন শৈলী ও তার মা সৎভাবে জীবন কাটায় না। এক বাবুর অনুগৃহীতা হয়ে তারা দিন কাটায়। 'বাবুর অনুগ্রহে অন্নবস্ত্রের দুঃখ না থাকিলেও তাঁর মন রাখিতে শৈলীর মাকে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইত তা সম্মুখেই দেখিয়াছিলাম। মনে হইত, তাহার তুলনায় বিশ্বনাথ - গলির ভিখারিনীও সুখী।' মালতীর পিসীকে সাবধান করে দিতে গিয়ে পূর্ণশশী খোঁজ নিয়ে জানলেন শৈলীর মা যে কদাকার শিশুটিকে মানুষ করবার জন্যে দিন পনেরো আগে নিয়ে এসেছে মালতী তাকেই দেখতে যায়। ব্যাপার কী বুঝতে পারেন না পূর্ণশশী, শেষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমস্তটা, 'অধিকাংশ সময়েই দেখিতাম কোনো একখানা বই কি সেলাই হাতে লইয়া সে আমার ঘরের সেই বড় জানালাটায় বসিয়া আছে শৈলীর ঘরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া। ও বাড়ির খোকার কান্নার শব্দ শুনিলেই কেমন উৎকর্ণ ও অস্থির হইয়া উঠে সে!' ছেলেটির মৃত্যু যখন আসন্ন তখন মালতী স্বীকার করেছিল 'সত্যি বলছি– এই ওর পাষাণী মা।'

একা মালতী নয়, এরকম বহু মালতী আসত কাশীতে। তাদের নিরুপায়তার সুযোগ নিতে অনেকে। পূর্ণশশী লিখেছেন, বিধবা মায়া ও তার বিধবা মায়ের কথা। 'মায়া অধোগামী তাই মেয়ের সঙ্গে বিধবা মাতাও নির্বাসনদণ্ড মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়া বিদ্রোহ জানাল। অপমানে আত্মহারা অভিমানির পক্ষে যা সম্ভব আর কি! একটা পুণ্যাহের দিন বাড়ির অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে মাকেও গঙ্গাস্নানে পাঠিয়ে মায়া 'কলকাতার স্নান সারিয়া ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িল— তখন গ্রীষ্মকাল তবু সেমিজের উপর জামা— তার উপর দু'খানা কাপড় আটসাটভাবে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া কপাটে খিল দিল।' যখন দরজা ভাঙা হল তখন 'মেয়েটির সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গিয়াছে, মাথা এলোচুল পর্যন্ত—' উন্মাদিনীর মতো ছুটে এসে মা জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। শেষে মৃত্যু হল দু'জনেরই। 'একটি নয়— দু'দুটি জীবন— কিন্তু নারীর জীবনের মূল্য কি?' বাস্তবিকই তাই। আত্মীয় - স্বজন— পরিত্যক্তা এই তরুণী বিধবাদের শেষ আশ্রয় ছিল গণিকাপল্লী ডালমণ্ডী ও শিবদাসপুরীর গলিতে। সরোজিনী বা পূর্ণশশীর মতো আরো কয়েকজন সামাজসেবিকা চেষ্টা করলেও অর্থাভাবে এঁদের অনেক পরিকল্পনাই রূপ পেতে পারেনি। বোস মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন থেকে একটি বই প্রকাশের সংবাদ পাওয়া গেছে যার নাম 'কাশীবাসী তিনশ বিধবা মহিলার জীবন কাহিনী'। বইটি আমাদের চোখে পড়েনি। তাতে হয়ত থাকবে নীলিমা ভট্টাচার্য্যের মতো, বাসনাবতী দেবী ও আয়না দেবীর মতো বহু বিধবার একটানা দুঃখের গল্প। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ঘর ছেড়েছেন স্বেচ্ছায়। 'নৌকাডুবি'তে নলিনাক্ষের মা যেমন স্বামীর ওপর অভিমান করে ঘর ছেড়েছিলেন, তেমনি অভিমানে ঘর ছেড়েছিলেন, পূর্ণশশীর চোখে - দেখা যামিনী। স্বামীর দুর্ব্যবহারে ঘর ছাড়তে হয় বাসনাবতীকেও। এঁরা যদি নিজের কথা লিখতেন, তাহলে জানা যেত আরও কিছু নারীর মনের কথা। যেমন জানতে ইচ্ছে করে ননীবালা দেবীর কথা।

হিন্দু ঘরের ব্রাহ্মণ, বিধবা ননীবালা দেবী কাশীবাসিনী ছিলেন না মোটেই, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। এই দুঃসাহসিকা নারীই ভারতের প্রথম মহিলা রাজবন্দী। তিনি প্রথম কারাবরণ করেন কাশীতে। আসলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন পেশোয়ারে, সেখান থেকে নিয়ে আসে কাশীর জেলে। প্রতিদিন ডেপুটি পুলিশ সুপারিউটেনডেন্ট জীতেন ব্যানার্জি তাঁকে জেরা করতেন, সেই সঙ্গে চলত অকথ্য অত্যাচার। ননীবালার মুখ থেকে কোন কথাই বার করা গেল না। ব্যর্থকাম জীতেন ব্যানার্জি ননীবালামে চরম শাস্তি দিলেন। কাশীর জেলে মাটির নিচে একটা 'পানিশমেন্ট সেল' ছিল তাতে একটি মাত্র দরজা। আলো - বাতাসহীন সেই কক্ষে ননীবালাকে তিন দিন প্রায় আধ ঘন্টা সময় ধরে আটকে রাখা হল, তাঁর স্নায়ু শক্তিকে চূর্ণ করে দেবার জন্যে। তৃতীয় দিনে তাকে রাখা হল পয়তাল্লিশ মিনিট, সেদিন তালা খুলে দেখা গেল তাঁর কোন জ্ঞান নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে কাশী জেল থেকে বন্দিনীকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়। কাশীর ইতিহাসে লেখা রইল শুধু একটি নাম। ননীবালা যদি 'আত্মকথা' লিখতেন, তাহলে হয়ত কাশীকে আবার দেখতে পাওয়া যেত এক বিদ্রোহিনীর চোখ দিয়ে ফুটে উঠত কাশীর জেলখানার নিষ্ঠুরতম ফটোগ্রাফ, তা হয়নি, রয়ে গেছে শুধু ননীবালার স্বল্প ক'দিন কাশীবাসের দুঃখস্মৃতি।

আজকের যুগে বাঙালী মেয়েরা আর আশ্রয়ের খোঁজে কাশী যান কিনা জানা নেই, দ্রুত পট - পরিবর্তনের যে চিত্র চোখে ভাসে, তাতে কাশী এখন পুরোপুরিভাবে অবাঙালীদের শহর হয়ে গেছে। আশ্রয়হীন বাঙালী মেয়েদের একদা 'শেষ আশ্রয় কাশী' এখন শুধু স্মৃতি, স্মৃতিকথার মধ্যেই যাকে খুঁজে পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে। সেই বিবর্তন - ধারাতেও দেখা যাবে কাশী শুধু বিনোদিনী বা রমাকেই আশ্রয় দেয়নি, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র বিদ্রোহিনী নায়িকা সত্যবতীও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কাশীতে।